সানা প্লাজা

জহুরুল হক (২১)

(এই গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর ঘটনাবলী বা কোন চরিত্র যদি বাস্তবের সাথে আংশিক বা সম্পূর্ণ মিলে যায় তবে তা হবে লেখকের অনিচ্ছাকৃত একটি কাকতালীয় ঘটনা এবং এজন্য লেখকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।)

বিকট শব্দে হুড়মুড় করে নয়তলা বিল্ডিংটা চোখের পলকে ধ্বসে পড়লো। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই এভাবে যে একটা বিশাল ইমারত ভেঙ্গে পড়তে পারে সেটা নিজের চোখে যারা দেখলো তারাও প্রথমে এটাকে স্বপ্ন টপ্ন জাতীয় কিছু একটা ভেবেছিল। হাজার হাজার মানুষ কাজ করে এই সানা প্লাজায়। তাদের উদ্ধারে আশপাশ থেকে সাধারণ মানুষ, দমকল, পুলিশ, র‍্যাব এবং আরও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছুটে এলো। শুরু হল বিশাল উদ্ধার যজ্ঞ।

কুদ্দুস মিয়া রাতের শিফটে ডিউটি শেষ করে এসে সানা প্লাজার বেসমেন্টের খুপরি ঘরে শুয়ে আছে। সানাপ্লাজায় যে আট নয়টা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী আছে তারই তিনটার ইমারজেন্সী জেনারেটর অপারেটর সে। অল্প বয়সে পাড়া পড়শীদের দেখাদেখি সেও জাহাজে চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছিল। সে শুনেছিল জাহাজের চাকরীতে অনেক বেতন তো আছেই, তার উপর চোখ কান খোলা রাখতে পারলে আরো লাখ লাখ টাকা উপরি আয় করা যায়। টাকা পায়সার প্রতি তার অসীম লোভ ছোটবেলা থেকেই। আর এই লোভই তাঁকে টেনে এনেছিল জাহাজের অয়েলারের কষ্টকর চাকরীতে। প্রচন্ড পরিশ্রম আর জানার আগ্রহ থেকে অল্পদিনেই সে জাহাজের ফিটারে উন্নীত হয়।

সেখান থেকেই ইঞ্জিন, জেনারেটর সম্পর্কে দক্ষতা লাভ করে কুদ্দুস। দক্ষ ফিটার হিসাবে আয় তার মন্দ ছিল না কিন্তু ঐ যে বলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। বেশী টাকার লোভ করতে গিয়ে চাকরী তো যায়ই, তার উপর কয়েক বছর জেলের ঘানিও টানতে হল তাকে। জেলটেল খাটার পর অনেক তেলপানি খরচ করে সানা প্লাজায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর এই কাজটা পেয়েছে। বলাই বাহুল্য, কুদ্দুস তার চিরাচরিত দক্ষতায় কিছুদিনের মধ্যেই বসদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং ফ্যাক্টরীর ভিতরের যন্ত্রপাতির কাজও পেয়ে গেছে।

বিভিন্ন সেকশনে ঘুরে ঘুরে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, মেরামত করে। তরতাজা রক্তগরম যুবক সে, হাজার হাজার মেয়ে কর্মীর সান্নিধ্যে কাজ করে মনটা স্বাভাবিক ভাবেই এদিক ওদিক হতেই পারে। তবে আর দশটা যুবকের মত পাইকারী ধরনের ছেলে সে মোটেই নয়, চয়েস আছে তার। সামুদ্রিক জাহাজে কাজ করার সুবাদে বেশ খানিকটা ইংরেজি বলতে পারে সে বেশ ডাঁট মেরে। অনেকেই তাকে ফোরম্যান বা ফিটার না ভেবে বিদেশ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার ভেবে বসে। তার এই ইংরেজি বলা ডাঁটের কারণেই কিনা কে জানে ডিজাইন সেকশনের রেশমা তার দিকে বেশ তোয়াজের সাথেই তাকায়।

বেশ সুন্দরী তন্বী মেয়েটা। বড়লোকের মেয়ে হলে কি হত বলা যাচ্ছে না তবে গরীব গার্মেন্টস কর্মী হয়েও তার যে ভাবসাব তাতে যে কারো চোখে পড়তে বাধ্য। একদম ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসারের মত চালচলন তার। এর মধ্যেই কয়েকবার কথাও বলা হয়ে গেছে কুদ্দুসের সাথে তার। একদিন টিফিনের সময় তার বেসমেন্টের ঘরে এসে হাজির। কুদ্দুস হতচকিত হয়ে কিছু বলার আগেই মেয়েটা বলে উঠলো, "আপনার জন্য চিংড়ি মাছ দিয়ে বেগুনের তরকারী আনলাম, মা দিয়েছে।" মেয়ের সাহস দেখে অবাক হলেও কুদ্দুস সাদরেই তার চিংড়ির তরকারী দিয়ে দুপুরের ভাত খেয়েছে। এরপর যে বিয়েশাদীর কথা উঠবে তা সে বুঝে গেছে। উঠলে উঠুক, তার আপত্তি নাই, রাজী আছে সে।

বেসমেন্টের ঘরে শুয়ে চোখ বুঁজে এসব যখন ভাবছে তখনই ঘটলো অঘটনটা। বিকট কড়কড় শব্দ আর হৈ হল্লা শুনে সে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বের হয়ে দেখে চারিদিকে শুধু ধুলাবালির মেঘ আর মানুষের ছুটাছুটির শব্দ। বিদ্যুৎ চলে গেছে,

অটোমেটিক জেনারেটরগুলো চলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আলো জ্বলছে না কোন এক অজ্ঞাত কারণে। কুদ্দুস তার তিন ব্যাটারীর টর্চটা নিয়ে বের হল, কিন্তু সিঁড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। টনকে টন ভাঙ্গা কংক্রিট আর গার্মেন্টসের ছেঁড়া কাপড়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ। আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে- বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়েছে। উপরে কী হচ্ছে বুঝতে পারলো না তবে বেসমেন্টের এই অংশটা দুমড়ে মুচড়ে যায়নি।

বেসমেন্টটা মূলত গাড়ি পার্ক হিসাবে বানানো হলেও দারোয়ান ড্রাইভার জাতীয় কর্মীদের জন্য কয়েকটা ঘর আছে এই তলায়। ভবন ধ্বসে পড়লেও বেসমেন্টের খানিকটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে বলেই সে বেঁচে আছে। এখন পালাতে হবে। যেমন করে হোক পালাতে না পারলে এখানেই মরে পচতে হবে তাকে। লিফটের দিকে এগিয়ে এলো সে টর্চের আলোয়। লিফটের স্টেইনলেস ষ্টীলের দরজাটা বন্ধ, দরজার ফাঁক দিয়ে আলো ফেলে দেখলো লিফটটা নেই এই ফ্লোরে, টানেলটা ফাঁকা আছে। দ্রুত ব্রেইন কাজ করছে তার, এই খাড়া লিফট টানেলের ভিতর দিয়ে পালাতে হবে। এখন ষ্টীলের দরজাটা কোনরকমে খুলতে পারলেই হয়। রুমে ফিরে এলো সে।

তার সমস্ত কাজের অস্ত্রপাতি টুলবাক্স ঘরেই আছে। কাজের সুবিধার্থে হাতের কাছেই সব রাখে সে। একটা মিটার খানেক লম্বা শাবল তুলে নিল সে। টর্চটা অন করে রেখে শাবলটা দুই হাতে ধরে লিফটের দরজার ফাঁকে কোনরকমে ঢুকাতে পারলো চিকন দিকটা। এবার শুরু হল তার প্রচন্ড শক্তি প্রয়োগ। ধীরে ধীরে একটু ফাঁক হল দরজাটা। এবার শাবলটা আরেকটু ভাল করে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে আরো জোরে চাপ দিল। লিফটের দরজা আরো খানিকটা ফাঁক হল, কোনরকমে সে ঢুকতে পারবে। টর্চ দিয়ে টানেলের ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল। একটা পাতলা সার্ভিস ল্যাডার লাগানো আছে টানেলের দেয়ালে, সেটা বেয়ে উপরের তলায় যাওয়া যাবে। দেরী না করে মইটা বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরের দরজার সামনে এলো সে।

শাবল দিয়ে আগের কায়দায় এই দরজাটাও ফাঁক করে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এলো। এখানেও অন্ধকার, ভাঙ্গা ছাদ, পিলার আর পড়ে যাওয়া দেয়াল একাকার হয়ে আছে চারিদিকে। তবে সামান্য আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে পাশের করিডোরের শেষ প্রান্তের দিকে। সেদিকের ছাদ ধ্বসে পড়লেও দেয়ালের পাশ দিয়ে খানিকটা জায়গা চলাচলের উপযুক্ত আছে। কুদ্দুস টর্চ হাতে নিয়ে সেদিকেই হাঁটা শুরু করল। এদিকটায় সারি সারি দোকান, কম্পিউটার, বই, কসমেটিক আর কয়েকটা জুয়েলারীর দোকান নিয়ে এই গ্রাউন্ড ফ্লোরের শপিং মলটা। সব দোকান খোলা, এখানে ওখানে মরা মানুষের দেহ কংক্রিটে আটকে আছে। এক সারিতে তিনটা জুয়েলারীর দোকান। তারই একটা থেকে আইপিএস এর সাহায্যে হাল্কা একটা আলো জ্বলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কুদ্দুস। সন্দীপ জুয়েলার্সের মালিক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দোকানের সামনে, একটা ভারী বীম পড়ে মাথাটা ফেটে মগজ ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। সিন্দুকের চাবির রিংটা কোমরেই ঝুলছে।

দোকানটা ছাদসহ ভেঙ্গে পড়লেও মেঝের সাথে মিশিয়ে যায়নি, কারণ দেয়ালের পাশে ভারী লোহার গোদরেজ সিন্দুকটা থাকায় ছাদটা সিন্দুকের উপর আটকে আছে। কুদ্দুস মালিকের কোমরে ঝুলানো চাবিটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সিন্দুকের সামনে পৌঁছে গেল। বুকটা দুরু দুরু করছে, এই ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে পালানোর কথা সে ভুলেই গেছে। সামনে স্বর্ণকারের সিন্দুক, হাতে সিন্দুকের চাবি - কাঁপা কাঁপা হাতে চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলল সে। হাল্কা আলোয় চকচক করে উঠলো থরে থরে সাজানো সোনার অলঙ্কার আর সোনার বারগুলো। তার সাথে তাল মিলিয়ে কুদ্দুসের চোখ দুটোও যে চকচকে হয়ে উঠলো সেটা দেখার মত সৌভাগ্যবান কেউ ছিল না সেখানে। বিমান বন্দরে মাঝে মাঝে যে সোনার চোরাচালান ধরা পড়ে আর সোনার ছবি খবরের কাগজে ছাপানো হয় সেরকমই সোনার ইট এগুলো।

তাড়াতাড়ি একটা চটের বস্তা খুঁজে এনে সে পুরো সিন্দুক খালি করে বস্তায় ভরলো। এবার নজর পড়লো সামনের শোকেসটায়। সেটা ভেঙ্গে চুরমার। কাঁচের টুকরা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সাবধানে ভাঙ্গা কাঁচ থেকে হাত বাঁচিয়ে সমস্ত অলঙ্কার তুলে তুলে বস্তায় চালান করলো। নগদ টাকা যা পেল পকেটে ভরে ফেলল। এবার বেরুনোর পালা। স্বর্ণকার মশাইয়ের হাতে তিন ক্যারেট হীরা বসানো একটা সোনার আংটি জ্বলজ্বল করছে। টান দিয়ে ওটা খুলে নিজের আঙ্গুলে পরে

ফেলল কুদ্দুস। মরা মানুষ হীরার আংটি দিয়ে কি আর করবে। মরা স্বর্ণকার পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, ঐ হারামজাদা কুদ্দুস্যা, আমার দোকান লুট কইরা যাস কই তুই? লাশের দিকে চোখে চোখে তাকাতে ভয় লাগছে কুদ্দুসের। তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পাশের দোকানে ঢুকল। এটা আরো বড় জুয়েলার্স। বসুন্ধরা সিটিতেও এদের শাখা আছে। সিন্দুকের চাবিটা পাওয়া গেল না, তবে দেয়াল জোড়া কাঁচের শো কেসে যত গহনা পেল তাতেই বস্তা ভরে গেল। বস্তাটাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে আরো খানিকটা জায়গা করলো সে তারপর নগদ টাকা যা পেল সব ভরে ফেলল। একটা সাত ভরির নেকলেস খুব পছন্দ হয়েছে কুদ্দুসের। রেশমার গলায় খুব মানাবে। এবার বস্তার মুখটা একটা ইলেকট্রিকের তার দিয়ে বেঁধে ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল লিফট টানেলের দিকে। অসম্ভব ভারী হয়েছে বস্তাটা।

আশি কেজির কম হবে না। কমসে কম ত্রিশ কোটি টাকার সোনা হবে, মনে মনে হিসাব কষে ফেলল সে। গুলশানে বাড়ি কিনবে পাঁচ কোটির, তারপর রেশমাকে বিয়ে। ওহো, রেশমা কোথায়? তার তো চার তলায় কাজ করার কথা এখন! না তাকে ফোন করা যাবেনা এখন। আগে মালগুলো সামলাতে হবে। তারপর অন্য কিছু। লিফট টানেলের ফাঁক করা দরজা দিয়ে সোনা ভর্তি বস্তাটা নীচে ফেলে দিল সে। তারপর মই বেয়ে নিজে নামলো। বস্তা লুকানোর মোক্ষম একটা জায়গা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। বেসমেন্টেই আছে সেই জায়গা। সেদিকেই বস্তাটাকে টেনে নিয়ে চলছে সে।

বুক পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রেশমার কল। এখন ধরা যাবে না। আগের কাজ আগে। রেশমাকে বিয়ে করার আগে দুজনেই এখানকার চাকরী ছেড়ে দেবে। ব্যাঙ্কক অথবা সিঙ্গাপুর যাবে হানিমুন করতে। বস্তা নিয়ে তার রুমের পাশের স্টোর রুমে ঢুকল সে। এই রুমের মেঝের নীচে সেপটিক ট্যাঙ্ক। ম্যানহোলটা রুমের মাঝখানে। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলল সে। বিকট দুর্গন্ধে বমি এসে যাওয়ার উপক্রম। সারা বিল্ডিংয়ের টয়লেটের বর্জ্য পদার্থের ট্যাঙ্ক এটা। আস্তে করে সোনা ভর্তি বস্তাটা ট্যাঙ্কের ভিতর ছেড়ে দিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। ঢাকনার উপর বেশ কিছু জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে ওটাকে আড়াল করে ফেলল। তারপর স্টোরে তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এলো। জিন্দেগিতে কেউ কোনদিন এই সোনার খোঁজ পাবেনা সে ছাড়া। পরে সুযোগ মত উদ্ধার করতে হবে সোনা।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অবস্থা ওর। রুমে গিয়ে দু গাস পানি খেল আগে। উপরে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। হাতুড়ী ছেনী দিয়ে দেয়াল ভাঙ্গার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মোবাইলটা বের করলো। লাইন ম্যানেজারকে ফোন করতে হবে। ও বেঁচে আছে বেসমেন্টে সেটা জানাতে হবে।

লাইন ম্যানেজারের ফোনে রিং বাজছে। চারবার বাজার পর ওদিক থেকে কেটে দিল ফোন। হারামজাদা ম্যানেজার, ইচ্ছা করে লাইন কেটে দিল। ভেগেছে মনে হয়।

শফিকের পান বিড়ির দোকানে ফোন করলো। শফিকের দোকান সানা প্লাজার সামনে মেইন রাস্তার পাশেই। কুদ্দুসকে ভালভাবেই চেনে। খাতির আছে। গার্মেন্টসের জেনারেটর থেকে চোরাই লাইনের মাধ্যমে শফিকের দোকানে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় কুদ্দুস। এখন বিপদের সময় সাহায্য করবে না তো আর কবে করবে?

ফোন ধরল শফিক। চারদিক থেকে ভীষণ হট্টগোল শোনা যাচ্ছে ফোনে। অ্যাম্বুলেন্স আসার প্যাঁ পোঁ শোনা গেল। শফিক ওর জীবিত থাকার খবর শুনে আবেগে চিৎকার দিয়ে উঠল। বলল, "থাম দোস্ত, সবুর কর উদ্ধার কাজ চলছে। তুই বিল্ডিংয়ের কোন দিকটায় আছিস বল আমি উদ্ধারকারী দলের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যারকে জানাই।"

কুদ্দুস বলল, "ফোনটা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যারকে দে, আমি উনাকে বলে দিচ্ছি।"

শফিক ছুটলো মোবাইল হাতে, চিৎকার করছে, "খবর আছে, খবর আছে, জ্যান্ত মানুষের খবর পাওয়া গেছে।" লোকজন সরে গিয়ে ওর পথ করে দিচ্ছে। কয়েক জন সিপাহী ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল, "সামনে যাওয়া নিষেধ আছে।" সে সিপাহীদের সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ল। তার কাছে যে ভয়ানক সংবাদ আছে তা সরাসরি স্যারকে বলতে চায়। অন্য কাউকে সংবাদটা দিয়ে নিজের গুরুত্ব হারাতে চায় না শফিক। হৈ হল্লা শুনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব এগিয়ে এলেন সামনে। সিপাহীরা অ্যাটেনশান হয়ে স্যালুট দিয়ে পথ করে দিল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেবের সামনে গিয়ে ফোনটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "স্যার, আমার বন্ধু কুদ্দুস বিল্ডিংয়ের নীচে জ্যান্ত আছে, ফোন করেছে, আপনার সাথে কথা বলতে চায় স্যার। ওকে বাঁচান স্যার।"

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব ফোন হাতে নিয়ে পরিচয় দিতেই কুদ্দুস বলল, "স্যার, আমি বেসমেন্টের উত্তর দিকটায় আটকা পড়ে আছি, ঠিক যেখান দিয়ে জেনারেটরের ধোঁয়া বের হওয়ার পাইপ বের হয়েছে সেখানটায়। পাইপের ঠিক নীচের দেয়ালের কিছু ইট খুলে ফেললেই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন।"

হৈ হৈ করে একদল কর্মী নিয়ে সেদিকে ছুটলেন অফিসার। চক দিয়ে মার্ক করে দিলেন দেয়ালে, সেখানকার ইট খোলা শুরু হোল। মিডিয়াতে খবর পৌঁছে গেছে। ডজন দুয়েক টিভি ক্যামেরা ফিট হয়ে গেছে, লাইভ প্রচার করা হচ্ছে দেয়াল কাটার দৃশ্য। কুদ্দুসের ফোন কলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, সে একজন সৎ আর নিষ্ঠাবান কর্মী তাও বলা হচ্ছে। এরই মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার সরাসরি প্রচার হয়ে গেছে যারা কুদ্দুসকে খুব ভালভাবে চেনে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসায় বসে চা খেতে খেতে টিভিতে কুদ্দুসের খবর দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি সেক্রেটারীকে বলে দিলেন নিজের হাতে কুদ্দুসকে উদ্ধার করবেন। উদ্ধারকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমে যেন এক্ষুনি খবর দেওয়া হয়। তিনি হেলিকপ্টারযোগে রওয়ানা হয়ে গেলেন তড়িৎবেগে সানা প্লাজা অভিমুখে। প্রেস সেক্রেটারীকে কড়া হুকুম দিয়েছেন যেন সবগুলো টিভি চ্যানেলে তাঁর এই মহান উদ্ধারকর্ম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সামনের নির্বাচনে জেতার এটা বড় একটা মোক্ষম অস্ত্র হবে।

দেয়ালের ইট সরানো হয়ে গেছে প্রায় দেড় ফুট খানেক, কুদ্দুসকে ভিতরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভিতরে একটা ফ্লাড লাইট নামানো হয়েছে, যাতে ভিডিও রেকর্ডিং ক্লিয়ার হয়। টিভি ক্যামেরাগুলো থেকে একনাগাড়ে সম্প্রচার চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে গেছেন, এক হাতে ফুলের মালা, অন্য হাতে তাঁর নিজের কোম্পানির তৈরি মিনারেল ওয়াটারের বোতল। প্রথমেই তিনি পানির বোতলটা বাড়িয়ে দিলেন দেয়ালের ফুটো দিয়ে কুদ্দুসের দিকে। কায়দা করে নিজের মুখটা আর পানির বোতলের লেবেলটা এমনভাবে ক্যামেরার দিকে ধরলেন যেন তাঁকে চিনতে মানুষের ভুল না হয়। বিনা পয়সায় পানির বোতলের একটা বিজ্ঞাপন হয়ে যাওয়া দরকার। কুদ্দুসের পানি খাওয়া শেষ হলে শুরু হল তাকে টেনে বের করার পালা। উদ্ধারকর্মীরা সাবধানে ধরাধরি করে তাকে বের করে আনছে। মন্ত্রী সাহেব প্রশান্ত মুখে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে তাঁর নির্বাচনে জেতার অর্বাচীন পাঁঠা এগিয়ে আসছে। কোটি কোটি টাকার নির্বাচন বিনামূল্যেএই কুদ্দুস পাঁঠাকে দিয়ে জেতা যাবে। কুদ্দুস এখন সোনার চেয়েও দামি।

কুদ্দুস নির্বিঘ্নে মৃত্যুর দরজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও মনে চিন্তার শেষ নেই। পিছনে ট্যাংকে রেখে এসেছে ত্রিশ কোটি টাকার সোনা। উদ্ধারকাজ শেষ হলে আবার এই ধংসস্তুপে ফিরে এসে গোপনে সোনা উদ্ধার করতে হবে। ঠিকমত তুলে আনতে না পারলে সব পরিশ্রমই বৃথা। রেশমাকে বিয়ে করা আর হবে না।

[জহুরুল হকঃ জন্ম চাঁপাইনবাবগঞ্জ। পড়াশোনা অগণিত বিদ্যালয়ে আর জ্ঞানার্জন করে চলেছেন প্রকৃতির বিশাল জ্ঞানভান্ডার থেকে। পড়াশোনায় সাধারণ, টেনেটুনে পাস। মেরিন একাডেমির ২১তম ব্যাচ। নরদাম্প্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। গল্প টল্প লেখায় তেমন হাত নেই, শখের বশে লেখেন, নিজের দেখা কিছু ঘটনার সাথে খানিকটা মনের মাধুরী আর খানিকটা কল্পনা মিশিয়ে। পাঠকের দেওয়া সুনাম দুর্নাম দুটোই সসম্মানে মাথা পেতে নেন এই প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী লেখক।